প্রতিবেদন ১০৩

বিনিয়োগ পরিবেশ ও শিল্পাঙ্গনে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, রোড ১১ (নতুন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮ ০২) ৮১২৪৭৭০, ৯১৪১৭০৩, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪৫০৯০
ফ্যাক্স: (৮৮ ০২) ৮১৩০৯৫১
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd
http://www.cpd.org.bd/Blog/

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১১

স্বত্ব © সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

মূল্য
টাকা ৪০
USD 5

ISSN 1818-1538

C52011_2DR103_IPD

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ আয়োজন সহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার সপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। এসব সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিডি বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিপিডি সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও পেশাজীবী জনগণ, ব্যবসায়ী মহল, জনপ্রতিনিধি, নীতিনির্ধারকবৃন্দ, সরকারি আমলা, উন্নয়ন-অংশীদারসহ বিশেষজ্ঞগণ, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের নেতৃবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গ্রুপসমূহকে নিয়ে নিয়মিত নীতি-সংলাপ আয়োজন করে থাকে। সিপিডির লক্ষ্য হলো এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে এবং সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। সিপিডির প্রধান গবেষণা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: সামষ্টিক অর্থনীতি পর্যালোচনা; দারিদ্র্য, অসমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার; কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন; বাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিশ্বায়ন; বিনিয়োগের প্রসার এবং শিল্প কারখানা ও অবকাঠামোর উন্নয়ন; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ; মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা; এবং উন্নয়নের জন্য সুশাসন, নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান।

সিপিডির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সিপিডির একটি সক্রিয় প্রকাশনা কর্মসূচি (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিপিডি নিয়মিতভাবে **সিপিডি সংলাপ প্রতিবেদন সিরিজ** (CPD Dialogue Report Series) প্রকাশ করে থাকে।

বর্তমান প্রতিবেদনটি ***বিনিয়োগ পরিবেশ ও শিল্পাঙ্গনে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী*** শীর্ষক সংলাপের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সংলাপটি ১৫ জুলাই ২০০৯ তারিখে ঢাকায় এলজিইডি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন: *নাজমাতুন নূর*, সিনিয়র ডায়লগ সহযোগী, সিপিডি।

সহকারী সম্পাদক: *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*, পরিচালক, ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগ, সিপিডি।
সিরিজ সম্পাদক: *অধ্যাপক রেহমান সোবহান*, চেয়ারম্যান, সিপিডি।

সংলাপ প্রতিপাদ্য

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, শিল্প খাতের সার্বিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান - এই সব মিলিয়ে একটি বিশাল অবদান রেখেছে। বর্তমানে বিশ্বমন্দার প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতামূলক এ খাত বিশ্ববাজারে একটি কঠিন সময় অতিবাহিত করছে। এরই মধ্যে সর্বসাম্প্রতিককালে এ খাতে কিছু অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা থেকে বিভিন্ন রকমের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতে করে সম্ভাবনাময় এ খাতটির ভবিষ্যত নিয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল মহল উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) মনে করেছে এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য শ্রমিক, মালিক, নীতি-নির্ধারক, সুধী সমাজ সহ সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এই আলোচনার একটি আবহ তৈরি করার তাগিদ থেকে সিপিডি গত ১৫ জুলাই ২০০৯ তারিখে ঢাকার আগারগাঁও-এ এলজিইডি সেমিনার কক্ষে "**বিনিয়োগ পরিবেশ ও শিল্পাঙ্গনে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী**" শীর্ষক এক সংলাপের আয়োজন করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী *লে. কর্নেল (অব.) ফারুক খান, পিএসসি, এমপি* এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিপিডি'র চেয়ারম্যান *অধ্যাপক রেহমান সোবহানের* সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সংলাপে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য*, ডিষ্টিংগুইস্ড্ ফেলো, সিপিডি। সংলাপে তৈরি পোশাক শিল্পের সাথে যুক্ত মালিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং দেশের খ্যাতনামা আইন ও শ্রম বিশেষজ্ঞরাও উপস্থিত ছিলেন (তালিকা সংযুক্ত)।

সংলাপের শুরুতে সভাপতি *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* সকল অংশগ্রহণকারীকে অভ্যর্থনা এবং মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীকে তার মূল্যবান সময়ের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন সিপিডি'র পক্ষ থেকে এ ধরনের আয়োজন নতুন নয়। ২০০৬ সালেও অনুরূপ এক পরিস্থিতিতে সিপিডি সরকার, মালিক ও শ্রমিক এই তিন পক্ষ সহ একটি সংলাপের ব্যবস্থা করেছিল। সেখানেও বর্তমান বাণিজ্য মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, যদিও তখন তার অবস্থান ছিল ভিন্ন জায়গায়। তবে এটি নিশ্চিত যে, এ ব্যাপারে তার সদিচ্ছার বা সক্রিয় প্রচেষ্টার কোন পরিবর্তন এখনও ঘটেনি। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এ খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্বার্থে সবাই এক সাথে কাজ করার ব্যাপারে একমত হবেন। সংলাপের এ পর্যায়ে তিনি সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক *অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানকে* সূচনা বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান।

সূচনা বক্তব্য

সংলাপ আয়োজনের পটভূমি রচনা করতে গিয়ে সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক *অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান* উল্লেখ করেন যে, বিগত ২০০৬ সালে অনুরূপ এক পরিস্থিতিতে সিপিডি আয়োজিত সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল এ শিল্পে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের ভিত্তি শক্তিশালীকরণ। ২০০৯ সালে এসে নতুন করে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রেক্ষিতে এই সম্পর্ক সত্যিকার অর্থে কতটা মজবুত এ নিয়ে সকলের মনে প্রশ্ন জাগছে। ফলে আবারও এ বিষয়ে আলোচনায় বসা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

তিনি কিছু তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরে জানান, ঠিক এ মুহূর্তে বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে একটি নেতিবাচক বা স্থবিরতার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় চলমান বিশ্বমন্দার আবহে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অর্থবছরের গত দুই

quarter এর তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় তৈরি পোশাক খাতের সার্বিক প্রবৃদ্ধি বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ঋণপত্র খোলার হার কমে যাওয়া (মূলধনী যন্ত্রপাতি (৩৫% কম), কাঁচামাল আমদানি (৪.৫% কম) এবং মেয়াদি ঋণ (১০% কম)) থেকে এই পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হয়েছে। যেহেতু দেশের মোট শিল্পের ৯০ শতাংশ উৎপাদন আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে, ফলে এ খাতের গতিবিধি বা বিনিয়োগ পরিস্থিতির সাথে দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধির প্রকৃতিও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ কারণেই সামগ্রিকভাবে শিল্পাঙ্গনে একটি অস্বস্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ রকম একটি পরিস্থিতিতে সৃষ্ট অস্থিরতা এ মুহূর্তে মোটেই কাম্য নয়, কেননা তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতের জন্য বছরের এ সময়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্রেতাদের চাহিদা মাফিক যাবতীয় শীতকালীন অর্ডার প্রস্তুত করার সময় এখনই। এই মুহূর্তে বাধাগ্রস্ত হওয়ার অর্থ শুধুমাত্র ক্রেতাদের আস্থা হারানোই নয়, এই বৈশ্বিক মন্দার সময়ে অন্যান্য প্রতিযোগীদের কাছে মূল্যবান বাজারও হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। তাই এই অস্থিরতা দূর করে এ খাতের আশু মঙ্গলায়নে সকল পক্ষের প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনার একটি ক্ষেত্র তৈরি করতেই এই সংলাপের আয়োজন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এসব অস্থিরতার কারণ নিয়ে বিভিন্ন রকমের তত্ত্ব শোনা যাচ্ছে। কখনও শোনা যাচ্ছে ঝুট ব্যবসায়ীদের সাথে ঝামেলার জের, স্থানীয় লোকজন বা প্রশাসনের সম্পৃক্ততার কথা শোনা যায়, কমপ্লায়েন্সের অভাব, মজুরি সংক্রান্ত সমস্যা বা মধ্যম স্তরের শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সাথে সমস্যা, আবার কখনও সম্পূর্ণ বিদেশি প্রতিযোগীদের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রমূলক নাশকতার অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে। তাই সমস্যার প্রকৃত কারণগুলো চিহ্নিত করে এই সংকট থেকে আশু উত্তরণের পথগুলো খোঁজাই বর্তমান সংলাপের উদ্দেশ্য। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, মাননীয় মন্ত্রী এ সকল নীতি পরামর্শ গ্রহণ করে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন।

এ পর্যায়ে সংলাপের সঞ্চালক *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য* অধ্যাপক রহমানের বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে আলোচনার ধারা নির্ধারণে একে দুই ভাগে ভাগ করেন। প্রথম ভাগে বর্তমান অস্থিরতার কারণ নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা বলবেন, এবং পরবর্তীতে পরিস্থিতি উত্তরণে করণীয় নিয়ে বলা হবে। এ আলোকে সংলাপে বক্তাদের আলোচনাকে বিষয়ভিত্তিকভাবে তুলে ধরা হলো।

মুক্ত আলোচনা

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত

মালিকপক্ষের প্রতিনিধিগণ, ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা মালিক এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক নেতারা সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনার যে বিবরণ এবং বিশ্লেষণ প্রদান করেন, তার মধ্যে শ্রমিকদের কিছু অসন্তোষের কথা বারবার প্রতিফলিত হয়। সার্বিক পর্যবেক্ষণে বলা যায় ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ হচ্ছে, কারখানার ভেতরের শ্রমিকদেরকে উত্তেজিত করা হচ্ছে, এমনকি কমপ্লায়েন্ট কারখানাগুলোও আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

সম্প্রতি ঘটিত কয়েকটি সহিংস ঘটনার রূপ তুলে ধরতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কারখানার মালিক, হামীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক *জনাব এ কে আজাদ* জানান, ঘটনার দিন আশুলিয়াতে বিভিন্ন কারখানা থেকে কিছু শ্রমিক এসে একটি জনসভা মতো আয়োজন করে। এতে তার ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকদেরকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে

তা ব্যর্থ হয়। কেননা তার কারখানায় কোন দেনা-পাওনা বাকি নেই এবং সামনে শিপমেন্টের সময়সীমা বাঁধা রয়েছে। ফলে বহিরাগতদের সাথে তার শ্রমিকদের বাদানুবাদ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ঘটে। পরে এই বহিরাগতরা কারখানার মালামাল ও যন্ত্রপাতিসহ প্রায় ১০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ক্ষতি সাধন করে।

জনাব আজাদ তার কারখানার পার্শ্ববর্তী দুলাল ব্রাদার্সের উদাহরণ দিয়ে বলেন এটি সর্বোচ্চ মানের কমপ্লায়েন্ট ফ্যাক্টরি হিসেবে পরিচিত, যেখানে কর্মীদের সন্তানদের খেলাধুলার জন্য পার্ক, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের মতো সুবিধাও দেওয়া হয়। সেখানে হঠাৎ শ্রমিকরা একযোগে দাবী করে তাদেরকে ৩৫%-৭০% বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। এবং তাদের আন্দোলনের মুখে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বহিরাগত শ্রমিকরাই দুলাল ব্রাদার্সের শ্রমিকদেরকে উসকানি দিয়ে বিশৃঙ্খল করে তুলেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এই একই ঘটনার ভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা তুলে ধরেন সিপিবি'র *অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ*। তিনি জানান, হামীম গ্রুপের কারখানায় ঘটিত সহিংসতার আগের দিন চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে আলোচনার আহ্বান জানানো হয়। আলোচনা সাপেক্ষে এবং সকল সমস্যার আশু সমাধানের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে সকল পক্ষের প্রতিনিধি মিলে শ্রমিকদেরকে জড়ো করে এই সমঝোতার খবর পৌঁছানো হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তারা সকলে বিচ্ছিন্ন থাকায় তা সম্ভব হয়নি। এ সময় তাদেরকে জড়ো করা বা কোন মাইকের ব্যবস্থাও করা যায়নি। পরবর্তীতে মালিকপক্ষ থেকে ওই সভাস্থলে আসার ব্যপারে অনীহা দেখা যায়, যার কারণে শ্রমিক নেতৃবৃন্দও ফিরে চলে আসে। তিনি মনে করেন ওখানে উপস্থিত হাজারো শ্রমিককে বোঝানোর জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার ছিল, তা করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ শ্রমিকদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনার ফলেই সেদিন এই ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

মজুরি সংক্রান্ত অভিযোগ: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাঝেই নিহিত প্রকৃত সমাধান

পোশাক শিল্পে এরকম ধারাবাহিক অস্থিরতা ও সহিংসতার কারণ হিসেবে শ্রমিকদের মজুরি স্বল্পতা ও অনিয়মিত মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়টিই বারবার প্রাধান্য পায়। সাধারণত দেখা যায় অনিয়মিত মজুরি, যা থেকে মূলত শ্রমিক অসন্তোষের সূত্রপাত হয় - এ ধরনের ঘটনা সোয়েটার কারখানাতে বেশি ঘটে। কেননা সেখানে মজুরি সংক্রান্ত যথাযথ চুক্তি কাঠামো নেই। অন্যদিকে মালিকপক্ষ থেকেও মজুরি নিয়ে শ্রমিকদের অন্যায্য দর কষাকষির অভিযোগ রয়েছে।

তৈরি পোশাক শিল্পের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সিপিবি প্রেসিডিয়াম সদস্য *জনাব শহীদুল্লাহ চৌধুরী* বলেন যে, এই শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো শুরু হওয়ার মাত্র ২০ বছরের মধ্যে এ শিল্প ২৬ লাখ মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এই শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোক্তা বা মালিক গোষ্ঠীর পাশাপাশি সমান অবদান রেখেছে সাধারণ শ্রমিক গোষ্ঠী। কিন্তু তারা এই অবদানের কোন প্রকৃত স্বীকৃতি কখনোই পায়নি। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সম্মান বা সুযোগ-সুবিধার দিকে যথাযথ দৃষ্টিপাত করেনি। তিনি বলেন শ্রমিকরা তাদের নিম্ন আয়ে যেখানে আবাস বাঁধেন, সেখানকার পরিবেশে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক বা দায়িত্ববোধের দিকটি গড়ে ওঠে না। ফলে তাদের কর্মস্থল অর্থাৎ কারখানার ব্যাপারেও তাদের মালিকানাবোধে ঘাটতি থেকে যায়। উপযুক্ত শ্রম পরিবেশের জন্য এই দিকগুলো

খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এসবই তাদের মধ্যে ভালো-খারাপ অনুধাবনের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে। অথচ গত ২০ বছরে এ শিল্পে শ্রমিকদের উন্নয়নে বিশেষ কোন সংস্কার ঘটেনি।

অন্য আরেকটি দিক টেনে এনে *জনাব শহীদুল্লাহ চৌধুরী* বলেন এ শিল্পের উত্তরণে সবসময় যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তা হলো - বেশি শ্রমিক নিয়োগ এবং মেশিন স্থাপন → পয়সার বিনিময়ে বেশি কর্মঘণ্টা → বেশি উৎপাদন → বেশি লাভ। কিন্তু একটি শিল্প বিকাশের ২০ বছর পরে এ কৌশল আর চলতে পারে না। এখন তা হওয়া উচিত: কম শ্রমিক → নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা → উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। কেননা, জীবনযাত্রার মানের সাথে উৎপাদনশীলতা সরাসরি জড়িত। জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে মানোন্নয়ন করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ঘটানো প্রয়োজন। শ্রমিকের সন্তুষ্টি এখানে একটি বড় বিষয়, কেননা একজন সন্তুষ্ট শ্রমিক তার দক্ষতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের লাভ বাড়িয়ে তুলবে। এর জন্য যদি সাময়িকভাবে শিল্পের আকার ছোট করতে হয় বা মালিকপক্ষের মুনাফা কমেও যায়, এই সংস্কারটি এখন অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি চীনের সাথে তুলনায় গিয়ে বলেন, সেখানে মজুরি ৮০ সেন্ট এবং বাংলাদেশে ২২ সেন্ট। কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কম, কেননা ওখানে শ্রমিকরা বেশি দক্ষ।

জনাব চৌধুরীর বক্তব্যের সাথে একমত প্রকাশ করে ওয়ার্কার্স পার্টি বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক *জনাব সাইফুল হক* বলেন শ্রমিকদের কল্যাণ ছাড়া দেশে শিল্প বা বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয় না বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে না। এবং এক্ষেত্রে বিশেষত ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া শিল্প বা উৎপাদন-বান্ধব পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব নয়। কেননা পুলিশের ভয় দেখিয়ে শিল্প পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না।

এক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি *মিজ শামীমা নাসরীন* বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের প্রচলিত মজুরির সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

ওয়ার্কার্স পার্টি বাংলাদেশের কনভেনর *জনাব হায়দার আকবর খান রনো* মনে করেন শ্রমঘণ্টা, বেতন স্বল্পতা, অনিয়মিত বেতন পরিশোধ ইত্যাদি সংক্রান্ত যেসব অসন্তোষ রয়েছে, সেগুলো মিটিয়ে ফেললে অস্থিতিকর পরিস্থিতি অনেকখানিই দূর হবে। এর বাইরে তিনি তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুসারে রেশনের ব্যবস্থা করার প্রসঙ্গ তুলে বলেন সরকারিভাবে এ পদক্ষেপটি বিবেচনা করা খুবই জরুরি।

এফবিসিসিআই সভাপতি *জনাব আনিসুল হক* মজুরি বৃদ্ধির দাবী প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন বেতন কাঠামোর নিম্নতম মজুরিভোগী শ্রমিকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। নতুন অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে এ বেতনে নিয়োগ হলেও অতি দ্রুত তার উত্তরণের ব্যবস্থা রয়েছে। তার মতে, সমস্যা হয় যখন শ্রমিক দর কষাকষি করে মজুরি বাড়ানোর চেষ্টা করে।

নতুন একটি প্রসঙ্গ অবতারণা করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট *জনাব সালাউদ্দিন স্বপন* বলেন, সাধারণত দেখা যায় অনিয়মিত মজুরি, যা থেকে মূলত শ্রমিক অসন্তোষের সূত্রপাত হয় - এ ধরনের ঘটনা সোয়েটার কারখানাতে বেশি ঘটে। তাই এ উপখাতের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন বলে তিনি

মনে করেন। এ প্রসঙ্গে *মিজ শামীমা নাসরিন*ও একমত প্রকাশ করে বলেন এ উপখাতের মৌসুমী নিয়োগ ও অনিয়মিত বেতন ব্যবস্থাই এরূপ অসন্তোষের জন্য দায়ী।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক *জনাব কে এম রুহুল আমিন* সোয়েটার উপখাতের অস্থিরতার প্রসঙ্গে আগের বক্তাদের সাথে একমত হয়ে বলেন যে সোয়েটার কারখানার মজুরি আগে থেকে নির্ধারিত করা থাকে না, ফলে শ্রমিকরা তাদের মৌসুমী মজুরি হ্রাস হলে কিছু বলতে পারে না। তাই এই উপখাতে পিস রেট নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করা জরুরি।

শ্রমিক-মালিক সমস্যায় সরাসরি আলোচনার সুযোগের অভাব

পোশাক কারখানার উপরের স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সাধারণ শ্রমিকদের বিশেষ একটা যোগাযোগ থাকে না। সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ মধ্যম স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। এবং এ স্তরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। শ্রমিকদের সাথে এরূপ দুর্ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আন্দোলন শুরু হয়, সেই সাথে তারা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। কারখানায় শ্রমিক-মালিক সরাসরি সংলাপের জন্য কোন উপযুক্ত কাঠামো না থাকায় এ ধরনের সমস্যা অতি দ্রুত ঘনীভূত হয়ে পড়ে। এরূপ সরাসরি আলোচনার অভাবের ফলে আরও কিছু নেতিবাচক বিষয় এবং একই সাথে এ সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কিছু পরামর্শ এই সংলাপে উঠে আসে।

বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক *অ্যাডভোকেট দেলওয়ার হোসেন খান* শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির ওপর জোর দিয়ে বলেন উৎপাদন বা শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের এটিই একমাত্র চাবিকাঠি। এবং এই সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মালিক পক্ষকেই ৯০-৯৫ ভাগ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি পরামর্শ দেন মালিকরা যদি প্রতি মাসে একবার তাদের কারখানার শ্রমিকদের সাথে সমস্যা নিয়ে সরাসরি আলোচনায় বসেন, তাহলে বাইরের কারও পক্ষে এ সুসম্পর্কে ব্যাঘাত ঘটানো সম্ভব হবে না।

এ প্রসঙ্গে সিপিবি'র *জনাব শহীদুল্লাহ চৌধুরী* বলেন, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে প্রতিনিধিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দেখা যায় যে, সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যম স্তরের কর্মকর্তা ব্যতীত কোন যোগাযোগের জায়গা নেই। কিন্তু শ্রমিকদের সাথে মালিকদের সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকলে, এটি তার মধ্যে দায়িত্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে, মালিকানাবোধ জাগ্রত করে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কমিটি সদস্য *জনাব তুহীন চৌধুরী* তার বক্তব্যে পোশাক কারখানার মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন শ্রমিকদের সাথে নানা রকম দুর্ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ঘটে আন্দোলনে। এ প্রসঙ্গে তিনি পরামর্শ দেন, মধ্যম বা তার চেয়ে আরেকটু উঁচু স্তরের কর্মকর্তাদেরকে যে বেতন, তা দিয়ে কর্তৃপক্ষ সহজেই কিছু মেধাবী, দরিদ্র শ্রমিক কর্মচারীকে শিক্ষিত করে, প্রশিক্ষণ দিয়ে, অর্থাৎ তাদের যোগ্য করে নিয়ে ওই প্রশাসনিক পদে উন্নীত করতে পারে।

মিজ শামীমা নাসরিন বলেন যখনই কোথাও গোলাগুলি বা অস্থিরতার আভাস দেখা যায়, শুধুমাত্র তখনই সেখানে দ্রুত আলোচনার কথা বলা হয় বা সমাধানের কথা ভাবা হয়। কিন্তু মূল সমস্যা বা তার পুরোপুরি সমাধানের কথা ভাবা হয় না। তিনি মন্তব্য করেন, কোন কারখানায় অসন্তোষ ঘটলেই মালিক নানাভাবে শ্রমিককে হয়রানি করা শুরু করে। কিন্তু এ শিল্পকে জাতীয় শিল্প হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই দূরত্ব কমাতে হবে।

এ প্রসঙ্গে *ব্যারিস্টার জেনিফা জব্বার* বলেন কারখানার নিজস্ব সমস্যা থেকে বহিরাগতরা সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনিও এসব সমস্যা দূরীকরণে মালিক এবং শ্রমিকদেরই সরাসরি আলোচনায় বসার ওপর গুরুত্ব দেন।

বিজিএমইএ'র পরিচালক *জনাব আরশাদ জামাল দিপু* শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বা আলোচনার ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বিশ্ববাজারের শর্ত হিসেবে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সব কারখানাকেই একটি কমপ্লায়েন্স অডিট পাশ করতে হয়। এ ব্যাপারে কারখানা মালিকরা এমনকি ক্রেতাদের কাছেও দায়বদ্ধ। এই কমপ্লায়েন্স অডিটের দুইটি দিক রয়েছে: একটি প্রযুক্তিগত; অন্যটি সামাজিক, যাতে কার্যকর grievence mechanism না থাকলে পাশ করা যায় না। সুতরাং, শ্রমিক নেতাদের দাবী অনুসারে কারখানার শ্রমিকদের কোন অধিকার না থাকলে কীভাবে এই কমপ্লায়েন্স অডিটগুলো উৎরানো সম্ভব হচ্ছে - তিনি এই প্রশ্ন রাখেন।

আবার, সংলাপে শ্রমিক-মালিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভিন্ন একটি দিক অবতারণা করেন আলোচকরা। তাদের মতে, জাতীয় স্বার্থে শ্রম আন্দোলনকে ইতিবাচক পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতাদেরকে অনেকখানি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমানে এ শিল্পটির জন্য যে সংকটময় মুহূর্ত অতিবাহিত হচ্ছে তা উত্তরণে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক একটি সম্পর্কের প্রয়োজন রয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করবে। আলোচনাই দাবী আদায়ের সর্বোচ্চ উপায়, এর ওপর জোর দিয়ে শ্রমিক নেতাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে একযোগে কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তবে এক্ষেত্রে পারস্পারিক আলোচনার কোন বিকল্প নেই বলেও সকলে মত প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে *জনাব এ কে আজাদ* বলেন যে সম্প্রতি সংঘটিত হামলার ক্ষেত্রে কোন শ্রমিক সংগঠন বা নেতার পক্ষ থেকে দুঃখ বা সহমর্মিতাও প্রকাশ করা হয়নি। একই অভিযোগ তুলেন বিকেএমইএ সভাপতি *জনাব ফজলুল হক*। এক্ষেত্রে তারা সরকারকে সম্পৃক্ত করে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে আরও ঘন ঘন আলোচনা হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট *জনাব কামরান টি রহমান* জোর দিয়ে বলেন দেশে প্রচলিত শ্রম আইন নীতিমালার আওতার মধ্যে থেকেই শ্রমিকদেরকে তাদের দাবী আদায় করতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্টা *রোকেয়া আফজাল রহমান* শ্রমিক নেতাদেরকে শুধুমাত্র শিল্পের স্বার্থে নয়, জাতীয় স্বার্থের কথাও চিন্তা করে দায়িত্ব নিয়ে একযোগে কাজ করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আহ্বান জানান। তবে তিনিও পূর্বতন বক্তাদের সাথে একমত হয়ে বলেন, এক্ষেত্রে পারস্পারিক আলোচনার কোন বিকল্প নেই।

বহির্শক্তির অপপ্রভাব

সবসময়ই এমন ধারা পরিলক্ষিত হয় যে যখন যেই সরকারই ক্ষমতায় থাকে তাদের স্থানীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দের এই শিল্পের শ্রমিক-মালিক সকলের কার্যক্রমে একটি অযাচিত হস্তক্ষেপের প্রবণতা দেখা যায়। *অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ* এটিকে তৈরি পোশাক শিল্পের সবচেয়ে বড় সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেন। তারা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সশস্ত্র ক্যাডাররের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাশিল করতে চায়। আবার ঝুট ব্যবসার দখল কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতায় বহিরাগত সন্ত্রাসীরা সাধারণত মালিকপক্ষে থাকার চেষ্টা করে, যা তাদের জন্য সুবিধাজনক। এরকম ক্ষেত্রে সবসময়ই সরকার এবং তাদের নির্দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিষ্ক্রিয় থেকে গিয়েছে। এ ধরনের নীরবতা এবং সমর্থনই পরবর্তীতে এরূপ আরও ঘটনার জন্ম দেয়।

ঝুট ব্যবসা দখল সংক্রান্ত চক্রের দিকে অভিযোগ তুলে *জনাব সালাউদ্দিন স্বপন* বলেন, ঝুট ব্যবসায়ীদের নিয়ে মালিকপক্ষ একেক সময় একেক রকম অবস্থান নেন। কখনও কারখানা শ্রমিকদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য স্থানীয় এসব সশস্ত্র বা প্রভাবশালী চক্রকে মালিকরা নিজের পক্ষে রাখার চেষ্টা করেন, আবার কখনও বলা হয় এদের চাঁদাবাজির অত্যাচারে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তিনি বলেন একসময় মালিকদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েই আজকে তারা এমন রূপ ধারণ করেছে যেখানে তারা শ্রমিকদেরকে দমন করে রাখে।

মিজ জাহানারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন তার পূর্বতন বক্তাদের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, বহিরাগত সন্ত্রাসীরা শ্রমিকদেরকে জোর পূর্বক বাইরে এনে সহিংস ঘটনায় সম্পৃক্ত করে। শ্রমিকরা অস্ত্র এবং স্থানীয় প্রতাপশালীদের ভয়ে আসতে বাধ্য হয়। কেননা তাদেরকে এদের অঞ্চলেই থাকতে হয়।

বাংলাদেশ ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট *জনাব মোঃ নাজমুল হাসান* শিল্প ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার জন্য বহিরাগত অপশক্তির প্রভাবকেই দায়ী করেন। তিনি তার নিজের কারখানায় হামলার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তার খাতের অবস্থা তৈরি পোশাক খাত থেকে কিছুটা ভিন্ন। সেখানে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক রয়েছে। হামলার দিন পুলিশ তাকে নিশ্চয়তা দেয় যে এলাকার পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ বহিরাগতদের দ্বারা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এতে তার শ্রমিকরা কোনভাবেই সম্পর্কিত ছিল না।

সিপিবি প্রেসিডেন্ট *জনাব মঞ্জুরুল আহসান খান* বারবার কমপ্লায়েন্ট কারখানাগুলো কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে প্রসঙ্গে বলেন, এসব কারখানার মালিকরা সামাজিক ও আর্থিকভাবে অনেক শক্তিশালী। শ্রমিকদের সাথে তাদের সম্পর্কও ভালো। ফলে পুলিশ বা স্থানীয় সন্ত্রাসীদেরকে তাদের মাসোহারা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং তারা প্রতিহিংসা থেকে এসব ঘটনা ঘটায়।

শ্রমিক সংগঠনের কাঠামোর অভাব

শ্রমিক সংগঠনের কাঠামোর অভাব সংক্রান্ত আলোচনা সংলাপে বারবার উঠে আসে। যেহেতু শ্রমিক সংগঠনগুলোর কোন প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত কাঠামো নেই, ফলে এরকম বিশৃঙ্খল/নিয়ন্ত্রণহীন আন্দোলনের দায়িত্বও

কেউ নিতে রাজী নয়। সংলাপে বক্তাদের আলোচনার একটি বড় অংশের প্রধান ইস্যু ছিল পূর্ণাঙ্গ ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো ও কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা।

বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ সভাপতি *জনাব সিরাজুল ইসলাম* ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের পক্ষে বলেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে শ্রমিকরা বিচ্ছিন্ন থাকবে, এতে করে এ খাতের অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে এই অস্থিরতাকে পুঁজি করে সুবিধাবাদী গোষ্ঠী দেশের এ সম্ভাবনাময় শিল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ অবস্থার সমাধানে দ্বিপাক্ষিক কমিটি প্রয়োজন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের নিয়ে Participation কমিটি করা হলে যেকোন অস্থিরতার পেছনে দায়ী প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা সম্ভব হবে।

তার এই বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক দলের সভাপতি *হাজী মোঃ শহিদুল্লাহ* বলেন যে বিভিন্ন সময়ে সহিংসতার ঘটনা ঘটলে একেকবার একেকজনকে দায়ী করা হয়। কোন পক্ষেরই কোন দায়ভার থাকে না। সুষ্ঠু কর্তৃপক্ষের অভাবে ভুল লোকেরা দায়ী হয়। কিন্তু Basic Union বা শ্রমিকদের একটি ফেডারেশন থাকলে অবস্থা ভিন্ন হবে। *জনাব সালাউদ্দিন স্বপন*ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রসঙ্গে বলেন, সাধারণ শ্রমিকের কথা বলার একমাত্র জায়গাই হল ট্রেড ইউনিয়ন। সুতরাং, এর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যকীয়। এ বিষয়ে *মিজ জাহানারা বেগম* বলেন সহিংস ঘটনার ক্ষেত্রে মিথ্যা মামলা দিয়ে শ্রমিকদের হয়রানি করে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করা সম্ভব নয়; এবং তা মালিক পক্ষ বা বিজিএমইএ-ও জানেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সুস্থ ধারার ট্রেড ইউনিয়ন প্রয়োজন। তা না হলে এরকম অরাজকতা চলতেই থাকবে, যার ওপর বিচ্ছিন্ন শ্রম নেতৃত্বের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

এ প্রসঙ্গে *জনাব কামরান টি রহমান* বলেন শ্রমিক-মালিক পারস্পরিক আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া ও এ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী একটি ত্রিপক্ষীয় Consultative Council রয়েছে, যা এ সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দেখা যায়, সারা বছরে এদের কার্যক্রম বড় জোর একটি সভার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বারবার তাগাদা দিলেও কাজ হয় না। এরকম একটি স্থবির পরিস্থিতির কারণেও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং এ সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণে তারা অবশ্যই আন্তরিক বলে তিনি দাবী করেন।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক *ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান* জনাব কামরানের বক্তব্যের সূত্র ধরে বলেন শ্রমিকদের একটি উপযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে তারা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারে। যেহেতু কারখানার ভেতরে তাদের আলোচনা করার কোন সুযোগ নেই, তাই তারা বাইরে আসতে বাধ্য হয়। এবং তখন দুষ্কৃতিকারীদের কাজের দায়িত্বও তাদেরকেই নিতে হয়।

বাংলাদেশে Basic Union করার অধিকারের বিষয়টি শ্রম আইনে কীভাবে গৃহীত হয়েছে, এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে *ব্যারিস্টার জেনিফা জব্বার* বলেন, সনদের ১৩ নং ধারা অনুসারে Participation কমিটির সাথে যেকোন সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে। তবে এই কমিটির সদস্যদেরকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হতে হবে। পোশাক শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হলো শ্রমনেতারা নির্বাচিত নন। ফলে তাদের কমিটি বা কার্যক্রম পুরোপুরি বৈধতা পায় না। আশুলিয়ার ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা গেল মালিক বা বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ

শ্রমনেতাদের সাথে ক্ষতিপূরণ বা অন্যান্য দিকগুলো নিয়ে আলোচনায় বসলো। কিন্তু সেখানে সেই কারখানার কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

বাংলাদেশ অ্যাপারেলস্ ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি *জনাব তৌহিদুর রহমান* স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা কিছুটা খারাপ। তাই Participation কমিটি দিয়েই এর অগ্রযাত্রা হওয়া উচিত। এ ধরনের কমিটি কিছুদিন চেষ্টা করার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

বিকেএমইএ'র *জনাব ফজলুল হক* সহিংস ঘটনাকে সম্পূর্ণই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করে বলেন কোন অবস্থাতেই শ্রমিকরা হামলা এবং ভাংচুরে যেতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ব্যাপারে শ্রমনেতৃত্বের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন শ্রমিক রাজনীতিতে প্রকৃত শ্রমিকদের সম্পৃক্ততা অনেক কম। ফলে শ্রমিকের সমস্যার ব্যাপারে নেতৃত্বের কোন মালিকানাবোধ থাকে না। তিনি আরও বলেন, যে কোন সংগঠনের কিছু প্রারম্ভিক শর্ত থাকে। পোশাক কারখানার মালিক না হলে কেউ বিজিএমইএ'র সদস্য পদ পায় না। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্ন পেশার মানুষরাও শ্রমিকনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম নিয়ে অতীতের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। শ্রমিকদের দিক থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ হলে এ সংগঠনের কার্যক্রমকে অবশ্যই স্বাগত জানানো হবে। কিন্তু বহিরাগতদেরকে কোন কারখানায় গিয়ে ইউনিয়ন করার ব্যাপারে তাদের আপত্তি রয়েছে বলে জানান *জনাব ফজলুল হক*।

জনাব ফজলুল হকের এ বক্তব্যে প্রদত্ত তথ্যের সাথে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের অনেকেরই দ্বিমত ছিল। তারা শ্রমিক সংগঠনে অন্য পেশাজীবী মানুষদের অন্তর্ভুক্তির আইনগত ভিত্তিও তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে *জনাব হায়দার আকবর খান রনো* বলেন, মালিকপক্ষের কোন অধিকার নেই কোন সংগঠনের বৈধতা নির্ণয় করার। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ীই ফেডারেশন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে নানান ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব অনুমোদন করা হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ একটা মৌলিকত্ব নেই। সকল কাঁচামালই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। এখানে রপ্তানি বাজার গড়ে উঠেছে শ্রম-নির্ভরতার কারণে। তাই শ্রমিকদেরকে তাদের সঠিক অধিকার, অর্থাৎ কারখানার ভেতরে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার শ্রমিক-মালিক সম্পর্কোন্নয়নে মূল সহায়ক হবে।

জনাব মঞ্জুরুল আহসান খান ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে ভিন্ন পেশাজীবির মানুষদের সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি সমর্থন করে বলেন এর একটি আইনগত ভিত্তি রয়েছে। তিনি সংক্ষেপে ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, ট্রেড ইউনিয়নকে সকলের বক্তব্য তুলে ধরার একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। তিনি একে গ্যাস চিমনির সাথে তুলনা করে বলেন এটির ভূমিকা হতে হয় ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া রোধ করার প্রতিষ্ঠান হিসেবে। এবং এক্ষেত্রে, মালিকপক্ষের সামন্তবাদী মনোভাব থাকলে চলবে না। বরং ট্রেড ইউনিয়নকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং একে মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষেরই স্বার্থে যথাযথভাবে ব্যবহার করার শিক্ষা মালিকপক্ষ থেকেই উৎসরিত হওয়া উচিত। মালিকদের নিজেদের স্বার্থেই সুসমন্বিত ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম প্রয়োজন, যাতে শ্রমিকরা শিখতে পারে যে দাবী আদায়ের জন্য ভাংচুর কোন পন্থা নয়। বর্তমানে কারখানার ভেতরে ইউনিয়ন না থাকায় বহিরাগত শক্তি পরিস্থিতিকে ব্যবহার করতে পারছে। এদের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া খুবই জরুরি।

এফবিসিসিআই সভাপতি *জনাব আনিসুল হক* ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে বলেন শ্রমিক নেতাদের এ নিয়ে সদিচ্ছার বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। দ্বিপাক্ষিকভাবে দেখলে শ্রমিকদের প্রতি তার পূর্ণাঙ্গ সহমর্মিতা রয়েছে। কিন্তু মালিকপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যাপারে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শঙ্কার উৎস সম্পর্কে তিনি বলেন একজন শ্রমিকের যেকোন সময়ই অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মালিকের সারা জীবনের সমস্ত বিনিয়োগ থাকে এই কারখানাতে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে এখন একের পর এক ভালো কারখানাও বন্ধ হয়ে যচ্ছে।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি মালিকপক্ষের মনোভাব এবং ইতিবাচক আন্দোলন

জনাব শহীদুল্লাহ চৌধুরী শ্রম আন্দোলন নিয়ে মালিকপক্ষের বিরূপ মনোভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন এর ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা এ শিল্পের স্বার্থে মোটেও কাম্য নয়। দেশে শ্রমিক আন্দোলনের কারণে শিল্পটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে মালিকপক্ষের যে ঢালাও মন্তব্য রয়েছে, তিনি তার বিরোধিতা করে বলেন যে এতে করে পারস্পরিক আস্থার জায়গাটি ভুল দিকে প্রভাবিত হয়। তিনি শ্রমিক নেতাদের উদ্দেশ্যেও বলেন, শিল্প না থাকলে শ্রমিকরাও নেই। সুতরাং দ্রুত শিল্পায়ন এবং শিল্পের উন্নতি সকলেরই কাম্য। তাই শ্রম আন্দোলনকে ইতিবাচক পথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে।

ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান মনে করেন কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়া প্রকৃত বা শুদ্ধভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিলে এ শিল্পের সংকটে অনেকখানি সমাধান আসবে। কেননা, নিয়মতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নের কিছু জবাবদিহিতার দিক রয়েছে। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষের দিক থেকে শিল্পবাচক মনোভাবের ঘাটতি রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অসাংগঠনিক স্বতন্ত্র আন্দোলনের ওপর কারও কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তার ফলেই নৈরাজ্য হয়, মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

জনাব কে এম রুহুল আমিন দোষীদের দ্রুত আইনী বিচার দাবী করে বলেন আশুলিয়ার ঘটনায় অশান্ত কারখানাগুলোর শ্রমিকদেরকে আলোচনায় সম্পৃক্ত হতে দেওয়া হয়নি। এ থেকেই ILO সনদের প্রতি মালিকপক্ষের মনোভাব বোঝা যায় এবং এর পরিবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জনাব সাইফুল হক এই একুশ শতকে এসে সামন্তবাদী মনোভাব নিয়ে শ্রমিকদের সাথে ব্যবহার করার প্রবণতা রোধ করাকে শ্রমিক-মালিক বিরোধ সমাধানের প্রথম শর্ত বলে মনে করেন। দেখা যায়, শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য ও নির্দিষ্ট দাবী (যেমন কম বা অনিয়মিত মজুরি) নিয়ে আন্দোলন করলেও মালিকপক্ষ তার মধ্যে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব টেনে আনেন; এবং এরকম ক্ষেত্রে স্থানীয় টাউট থেকে শুরু করে বিভিন্ন পক্ষ এর সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

জনাব সাইফুল আরও বলেন, বর্তমানে এ শিল্পটির জন্য যে একটি সংকটময় মুহূর্ত অতিবাহিত হচ্ছে, তা উত্তরণে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক সম্পৃক্ততার প্রয়োজন রয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করবে। শ্রমিক আন্দোলন খুবই সংক্রামক ঘটনা। এক জায়গার আন্দোলন অন্য কারখানাকে সহজেই প্রভাবিত করে। এমনকি কমপ্লায়েন্ট কারখানাকেও জড়িয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষকেই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে যেন এ রকম শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি না হয়। তিনি আরও বলেন, সকল বিচ্ছিন্ন আন্দোলনই এখন ট্রেড ইউনিয়ন

প্রতিষ্ঠার দিকেই ধাবিত হচ্ছে। অচিরেই মালিকপক্ষও একথা অনুধাবন করতে পারবেন। এখানে কোন পক্ষই প্রতিযোগী নয়। তাই সংকট থেকে উত্তরণের পথ নির্ধারণের জন্য শ্রমিক-মালিক-সরকার সবাইকে একসাথে বসতে হবে।

ILO সনদের স্বীকৃতি আছে, বাস্তবায়ন নেই

সংলাপের একটি বড় অভিযোগের বিষয় ছিল - বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-র বিভিন্ন আইন বা সনদে স্বাক্ষর করেছে, কিন্তু এদেশে কখনোই এগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান এই অভিযোগ টেনে বলেন মালিকপক্ষ যদিও মুখে ILO সনদের কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ করে না। *অ্যাডভোকেট দেলওয়ার হোসেন খান*ও এই সনদ বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ জোর দেন।

বাংলাদেশে ILO সনদ বাস্তবায়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে *জনাব কামরান টি রহমান* বলেন ILO স্বীকৃত ৩৫টি সনদ বাংলাদেশে অনুসমর্থিত হয়েছে, এবং এর ভিত্তিতে এদেশে একটি শ্রম আইন নীতিমালাও রয়েছে। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির *জনাব সাইফুল হক* মনে করিয়ে দেন যে তিন বছর আগে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অধিকাংশ কারখানাতে এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। তবে এ চুক্তি পুনরায় পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, শ্রমিকদের ন্যূনতম মানসম্পন্ন জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় পুনর্নির্ধারণ করা দরকার। ILO সনদ সংক্রান্ত বিষয়ে তার আরেকটি পরামর্শ ছিল যে সরকারকে স্বাক্ষরিত বা অনুমোদিত সনদগুলোর প্রকৃত বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট উদ্যোগসহ আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

আবার বিজিএমইএ'র সহসভাপতি *জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম* অভিযোগ করে বলেন, কারখানায় ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাস্তবায়ন বা কমপ্লায়েন্সের মান নিয়ে ইতিবাচক অর্জনগুলোকে শ্রমিক নেতারা কখনও তুলে ধরেন না। যেমন: সরকারেরই শ্রম মন্ত্রণালয়ের জরিপ অনুসারে ৯৯.৪% কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন সহ পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্র প্রদান, সাপ্তাহিক ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।

আইনী সংস্থার দুর্বলতার কারণে বারবার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে

জনাব সিরাজুল ইসলাম তার আলোচনায় বলেন, ২০০৬ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এসব সমাধানের ব্যাপারে কোন স্থায়ী বা সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তিনি মনে করেন যে, এসব সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সরকার ও মালিকপক্ষের মধ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া আইনি ব্যবস্থায়ও গলদ রয়েছে। ২০০৬ সালে সংঘটিত ঘটনাগুলোর তদন্ত প্রতিবেদন আজ অবধি প্রকাশিত হয়নি বা দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। বিজিএমইএ'র *জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম* এ বক্তব্যের সাথে একমত প্রকাশ করে বলেন যথাযথ তদন্তের প্রক্রিয়ায় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও শুভাকাঙ্ক্ষী সকল মহলের জড়িত থাকা প্রয়োজন।

জনাব এ কে আজাদ তার বক্তব্যে সরকারী পর্যায়ে দ্রুত আইনী হস্তক্ষেপ এবং কোন প্রকার প্রভাবমুক্ত ভাবে আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন। *জনাব তৌহিদুর রহমান* বলেন অগ্নিকাণ্ড বা নাশকতামূলক কাজের হোতাদের খুঁজে বের করে শাস্তির বিধান না করা হলে এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকবে। তবে এসব ঘটনার তদন্তের ক্ষেত্রে একটি বড় ব্যর্থতার জায়গা হল সরকারের বিভিন্ন সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ উল্লেখ করেন যে, কোথাও হামলার ঘটনা ঘটলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, তথা পুলিশ বা দমকল সেখানে দেরি করে পৌঁছায়। এমনকি কারও বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ থাকলেও সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং মামলা করা হয়েছে ভুল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। *জনাব সালাউদ্দিন স্বপন* এবং *জাহানারা বেগমের* বক্তব্যেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

এ বিষয়ে *জনাব কামরান টি রহমান* মন্তব্য করেন যে, শ্রমিক অসন্তোষ থেকে শিল্পের ক্ষতি সাধন মেনে নেওয়া যায় না। এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে অপরাধী আইনেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তার জন্য শ্রমিক বা বহিরাগত যারাই দায়ী হোক না কেন।

জনাব আনিসুল হক তৈরি পোশাক খাত নিয়ে সৃষ্ট ষড়যন্ত্র আবহের ব্যাপারে বলেন নিশ্চিতভাবেই এখানে কোন মহলের ইন্ধন রয়েছে। হয়তো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা দল নয়, তবে দলের খোলসে মুখোশ বদলে চলা হোতারাই এর জন্য দায়ী। কেননা, সরকার কখনোই চাইতে পারে না যে তাদের পরিচালিত প্রশাসনের দায়িত্বে কোন ঝামেলা তৈরি হোক। এখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি শক্ত ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ঠিক এই মুহূর্তে বিশ্ববাজার একটি খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এখন পরস্পরকে সাহায্য করার সময়। মালিকপক্ষের দিক থেকে দায়িত্ব হলো একটি কমপ্লায়েন্ট পরিবেশ তৈরি করা এবং তা ধরে রাখা। এক্ষেত্রে অসন্তোষ তৈরি করছে বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কিছু এনজিও এবং তাদের মদদে জড়িত হচ্ছে এই মুখোশধারী শ্রমনেতারা।

অনুনোমদিত ও নিবন্ধনহীন শ্রমিক সংগঠন

জনাব এ কে আজাদ অভিযোগ করেন অনুনোমদিত এবং নিবন্ধনহীন বহু শ্রমিক সংগঠন ইদানীং দেখা যাচ্ছে, যারা আসলে এরূপ নাশকতার ইন্ধন যোগাচ্ছে। এদের ব্যাপারে শ্রম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উপযুক্ত তদন্ত হওয়া দরকার।

বিজিএমইএ'র *জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম* একই প্রসঙ্গে বলেন এ শিল্পে যেকোন অস্থিরতা উস্কে দেওয়ার জন্য মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে অনাস্থা বা অবিশ্বাসের জায়গাটা প্রকট। এ পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে শ্রমিক রাজনীতির সাথে যুক্ত এমন কিছু শ্রমনেতা, যাদের প্রকৃত কোন ভিত্তি নেই। তারা সত্যিকার অর্থে এ খাতের জন্য কোন উপকারী ভূমিকা পালন করে না। বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এসব নেতৃত্বকে চিহ্নিত ও প্রকাশ করার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ জানান।

মধ্যস্থতাকরণে বাইরের পক্ষের সম্পৃক্ততা

জনাব মোঃ নাজমুল হাসান তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় অস্থিরতার অন্য আরেকটি দিক তুলে ধরে বলেন স্থানীয় মাস্তানরা বাইরে থেকে এসে হঠাৎ করে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তারপর তারাই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা

নিতে চায়। তিনি সকল পক্ষকে অনুরোধ করেন যেন যেকোন সমস্যা নিয়ে বাইরের কাউকে সম্পৃক্ত না করে নিজেদের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়। কেননা সেক্ষেত্রে তিন রকমের অসুবিধা ঘটে থাকে - নিরাপত্তা, সমঝোতা এবং আইনি বিচার। আবার কখনও কখনও পুলিশ সমঝোতা করার চেষ্টা করে, যা হয়তো অশান্ত কারখানাগুলোর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তোলে। তিনি পরামর্শ দেন যে, এ ধরনের ক্ষেত্রে সমঝোতা করার জন্য শিল্প ম্যাজিস্ট্রেট থাকা উচিত, যারা শিল্প পুলিশ ও শ্রমিক নেতা সহ ঘটনাস্থলে যাবে। তিনি শিল্প ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ওপর জোর দিয়ে তাদের জন্য এলাকাভিত্তিক কার্যালয়েরও সুপারিশ করেন। তিনি আরও মনে করেন যেকোন বিচারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা একটি আবশ্যকীয় দিক। অর্থাৎ যেকোন অস্থিরতার ক্ষেত্রে কী সমঝোতা হলো বা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে কী রায় পাওয়া গেল তা শ্রমিকদেরকেও খোলাখুলিভাবে জানানো উচিত।

আপৎকালীন তহবিল

জনাব এ কে আজাদের মতে কোন কোন ক্ষেত্রে কারখানা বিশেষে মজুরি অনিয়মিত হয়ে পড়ে, কারণ ক্রেতারা যেকোন মুহূর্তে তাদের অর্ডার বাতিল করে দেয়। এজন্য সরকারীভাবে একটি আপৎকালীন তহবিলের প্রয়োজন রয়েছে, যা সরকার এবং বিজিএমইএ উভয় পক্ষ মিলে পরিচালনা করতে পারে। *জনাব মোঃ নাজমুল হোসেন*ও মনে করেন যে, তৈরি পোশাক খাতের অস্থিরতা দূরীকরণে সরকার কর্তৃক পরিচালিত আপৎকালীন তহবিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী *লে. কর্নেল (অব.) ফারুক খান, পিএসসি, এমপি* সিপিডিকে এ সময়োপযোগী সংলাপটি আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সংলাপের সবচেয়ে ভালো দিকটি ছিল যে সকল অংশগ্রহণকারীর মধ্যেই সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা ছিল। তিনি বলেন, মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক স্থাপনে আলোচনা জরুরি। এই আলোচনার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করতে হবে, যেন ভবিষ্যতে কোন সমস্যা হলে তার দ্রুত সুরাহা করা যায়।

তিনি সংলাপে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের অবস্থানের কথা একে একে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তার বিশ্বাস, শিল্প কারখানায় ভাংচুর বা আগুন দেওয়া এসব শ্রমিকরা করে না। এসব বহিরাগত সন্ত্রাসীদের কাজ। এটিকে সরাসরি অপরাধ আইনে বিবেচনা করার দরুণ এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গতবারের চেয়ে এবারের গোলোযোগের দ্রুত সমাধান করা গিয়েছে। তিনি সহিংস ঘটনাসমূহের পেছনে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। দেশের শিল্প খাতকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে দল মত নির্বিশেষে একসাথে কাজ করা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তৈরি পোশাক শিল্পে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকলে বাংলাদেশ বর্তমানের তিন নম্বর অবস্থান থেকে দুই নম্বরে উত্তীর্ণ হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র, এক নম্বর স্থানে পৌঁছাতেও খুব বেশি সময় লাগবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন এরূপ অবস্থানের জন্য কৃতিত্বের একটি বড় অংশের ভাগীদার এদেশের শ্রমিকরা। তারা এখানে দ্রুত দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হওয়ায় আরও অধিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশেও যেতে পারছেন। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন বিশ্বমন্দার প্রেক্ষিতে হুট করে এখুনি

হয়তো মজুরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তবে শ্রমিকদেরকে আলোচনার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি বোঝাতে হবে।

শ্রম আইনের ব্যাপারে তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশ্‌তেহার মোতাবেক এই আইনের প্রকৃত বাস্তবায়নের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং এজন্য আবারও সকল পক্ষ মিলে কাজ করার ওপর তিনি জোর দেন।

তিনি প্রস্তাব করেন যে, শিল্পাঙ্গনে একটি সার্বিক সমন্বয় এবং আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখতে শিল্প এবং শ্রম, উভয় মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি একটি সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। তারা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল সফর করে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগের ভেতরে থাকতে পারেন, যা যেকোন সমস্যা সৃষ্টি হলে ত্বরিত সমাধানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। প্রয়োজনবোধে সংসদে শুনানির মতো আয়োজন করে হলেও এসব অস্থিতিশীলতা দ্রুত দূর করা যাবে।

এছাড়া তিনি তার একটি ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করে বলেন যে, আশুলিয়াতে বিজিএমইএ'র একটি স্থায়ী অফিস স্থাপন করা হবে। এই অফিসে যেকোন সমস্যার ক্ষেত্রে দ্রুত আলোচনার পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা করবে। সেখানে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সামাজিক কমপ্লায়েন্স ফোরাম রয়েছে, যাদের প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন শ্রমিক সমিতির কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারছে কিনা তা তদারকি করা। এই ফোরামের বৈঠক নিয়মিত ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় বলে তিনি জানান। তবে বাংলাদেশের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামোর ব্যাপারে তিনি বলেন এ মুহূর্তে পুরোপুরি না হলেও সক্রিয় ও যথাযথ কল্যাণ কমিটি বা Participation কমিটি দিয়েও এই ভূমিকা অনেকখানি পালন করা যায়, যা কিনা পুরোপুরি ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে উত্তরণের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে নিঃসন্দেহে সকল পক্ষই সুস্থ ধারার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম চায়, যা প্রকৃত পক্ষে শিল্প পরিবেশের জন্য সহায়ক হবে।

কারখানা ব্যবস্থাপনার দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি। যদিও এ শিল্প আজ অনেক ওপরে উঠেছে, মধ্যম স্তরের ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই কিছু সমস্যা রয়ে গিয়েছে। কারখানার ওপরের স্তরের কর্মকর্তারা অর্ডার সংগ্রহ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে শ্রমিকদের সাথে প্রতিদিনের যোগাযোগ সমন্বয় হয় মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে। এখানে ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা বেশ শোনা যায়, তবে তা ঘটলে চলবে না। কারণ এখনকার পারিপার্শ্বিকতায় শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব সম্মান এবং অধিকারের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। সাধারণত দেখা যায়, যেসব কারখানায় মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অভিযোগ থাকে, সেসব কারখানাতেই শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা বেশি ঘটে। অনেক সময় দেখা যায় মধ্যম স্তরের কর্মকর্তার কাছে দুর্ব্যবহারের শিকার হয়ে একজন শ্রমিক বাইরে গিয়ে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। এ ধরনের ঘটনা রোধে প্রয়োজনমতো দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে প্রমাণ সাপেক্ষে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, কারখানা পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

আপৎকালীন তহবিলের ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আশ্বস্ত করে বলেন, সরকার যেকোন শিল্পেরই, তা হোক বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, দুঃসময়ে পাশে দাঁড়াতে তৎপর থাকবে। এ প্রসঙ্গে তিনি সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য সরকার ঘোষিত সহায়তা প্যাকেজের কথা তুলে ধরেন।

সবশেষে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সকল পক্ষকে আহ্বান জানান যেন "ক্ষমতা নয় দায়িত্ব" এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সকল সমস্যাকে মোকাবেলা করা হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এখানকার এই আলোচনা থেকে যে মূল বিষয়গুলো উঠে এসেছে তা উপস্থিত শ্রমিক নেতাদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমিক ভাইদের কাছেও পৌঁছাবে। তিনি সাম্প্রতিক গোলোযোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সহ সকল ধরনের সহায়তায় সরকার যথাসম্ভব চেষ্টা করবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ এবং সমাপনী বক্তব্য

সংলাপের সঞ্চালক সিপিডি'র ডিষ্টিংগুইস্‌ড্ ফেলো *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য* আলোচনার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরে বলেন, প্রথমত, সকল পক্ষই একটি ব্যাপারে একমত যে, এসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দৃষ্টান্তমূলক বিচার হতে হবে। তবে এক্ষেত্রে যে প্রসঙ্গটি শ্রমিক পক্ষ থেকে বার বার উঠে এসেছে, তা হলো বিচারের নামে অযথা হয়রানিমূলক মামলা না দিয়ে, প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদেরকে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে খুঁজে বের করে যেন বিচার করা হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, এ ধরনের আক্রমণের ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটে আসছে ২০০৬-২০০৯ পর্যন্ত। একেক বার একেক পক্ষ থেকে একেক জনকে ভিন্ন ভিন্ন খোলসে দায়ী করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমিকদের আন্দোলন; মালিকদের অনিয়মিত এবং নিম্ন মজুরি প্রদান সহ অন্যান্য অনিয়ম; বহিরাগতদের বিশেষত ঝুট ব্যবসা কেন্দ্রিক ঝামেলা; এমনকি চতুর্থ অরেক পক্ষের কথাও বলা হয়। এ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ, যথাযথ ও স্বচ্ছ গবেষণা তদন্তের জন্য টাস্ক ফোর্স হওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয় দিকটি হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উপায়ে শ্রমিক সংগঠন করার সুযোগ তৈরি করতে হবে। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ধাপে ধাপে এগুলো ভালো হয় নাকি ত্রিপক্ষীয় কমিটি বা কল্যাণ কমিটি -- কোনটি যথোপযুক্ত পদ্ধতি হয়, তা নির্ধারণ করতে হবে।

চর্তুথত, ত্রিপক্ষীয় যে কাঠামো বা সংগঠন রয়েছে, তাকে আরও সক্রিয় ও সক্ষম করে তুলতে হবে। এতে শ্রম মন্ত্রণালয়কে কার্যকরভাবে যুক্ত করে জাতীয়ভাবে একটি বাতাবরণ দেওয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করা দরকার।

শ্রমিকদের জীবনমান, অধিকার ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অধিক শ্রমিক → অধিক উৎপাদন → অধিক মুনাফা -- এ চক্র ভেঙ্গে তার পরিবর্তে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চক্রে ঢুকতে হবে। অর্থাৎ, কম শ্রমিক → বেশি উৎপাদনশীলতা → বেশি মুনাফা -- এ পরিস্থিতির দিকে যেতে হবে। প্রতিযোগিতা সক্ষমতার বৃদ্ধির জন্যও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা জরুরি এবং এর জন্য সরকারি সমর্থন ও মালিক পক্ষের উদ্যোগ প্রয়োজন হবে। এর ফলে আর্থিকভাবে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রমিকদের আয়ে ভারসাম্য সৃষ্টি হবে।

এছাড়া মালিক-শ্রমিক দুই পক্ষেরই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হওয়ার ওপর জোর দেন তিনি। উভয়ের অধিকার ও সমস্যার ব্যাপারে উভয় পক্ষকেই সচেতন করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। *ড.ভট্টাচার্য* আরও বলেন, কারখানা পর্যায়ে বেতন বা কমপ্লায়েন্স সমস্য সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের একটি কার্যকর ব্যবস্থা থাকা দরকার।

আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি ছিল শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের বাইরে আলোচনার আরেকটি বড় ক্ষেত্র। এখানে প্রথম বিতর্কের প্রসঙ্গ ছিল - বর্তমান সমস্যাটি কি শ্রম সম্পর্কের নাকি প্রচলিত অপরাধ আইনের বিষয়। এখানে আইনী দিকটিকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। আবার অন্যদিকে প্রকৃত দোষীদের না ধরে সাধারণ শ্রমিকদের হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে *ড. ভট্টাচার্য* বলেন শ্রম আইনের কাঠামো নিয়ে একটি পৃথক এবং বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে, তা এই সংলাপের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বোঝা যায়।

শ্রম আইনের বিষয়ে শিল্প পুলিশের পাশাপাশি শিল্প ম্যাজিস্ট্রেটের কথা উল্লেখিত হয়েছে; এবং যেটিতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে তা হলো কোন অবস্থাতেই যেন পুলিশের বা বহিরাগত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে সমঝোতার বা সমাধানের চেষ্টা না করা হয়।

আলোচিত অরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মালিক বা রপ্তানিকারকরা তাদের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত ঘটনা বা পরিস্থিতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা চাপের মুখে পড়লে সেই কারখানার জন্য সরকার থেকে কোন প্রকার ব্যাংক গ্যারান্টি বা সাময়িকভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি আপৎকালীন তহবিলের ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে *ড. ভট্টাচার্য* বলেন, একটা সময় ছিল যখন সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে এ ধরনের সহায়তা দেওয়ার বিপক্ষে একটি শক্ত ধারা ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এসব ধারার বক্তারাই আরও বড় আকারে সহায়তা দিয়ে চলেছে।

মজুরি পুনর্নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি দ্বিধা প্রকাশ করে বলেন, বিশ্বমন্দার প্রেক্ষিতে মজুরি কাঠামো সংস্কারের এখনই সঠিক সময় কিনা সে ব্যাপারটি বিবেচনার দাবী রাখে। তবে তিনি এও বলেন যে সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন বাড়ানো হলে দরিদ্র শ্রমিকদের কথাও বিবেচিত হওয়া দরকার। না হলে এর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না, এবং পরবর্তীতে আবার একটি আলাদা সমস্যা হয়ে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

পরিশেষে *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য* বলেন এই আলোচনার সবচেয়ে ইতিবাচক দিকটি হলো সবাই দেশের এই রপ্তানি খাতকে রক্ষা করতে চায়। তাই সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে আস্থার জায়গাটি তৈরি করার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের মূল্যবান মতামত ও সময়ের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সংলাপের সমাপ্তি টানেন।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

জনাব শফিউদ্দিন আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ

জনাব সৈয়দ এরশাদ আহমেদ
প্রেসিডেন্ট, অ্যামচ্যাম বাংলাদেশ এবং
নির্বাহী পরিচালক, এক্সপিডিটর বাংলাদেশ লিমিটেড

জনাব সৈয়দ সুলতানউদ্দিন আহমেদ
সহকারী নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্স)

মিজ আরিফা আক্তার অনু
অফিস সেক্রেটারি
কর্মজীবী নারী

মিজ কল্পনা আক্তার
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি

মিজ নাজমা আখতার
প্রেসিডেন্ট, সংযুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন এবং
চেয়ারম্যান, আওয়াজ ফাউন্ডেশন

জনাব কে এম রুহুল আমিন
সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

জনাব এ কে আজাদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হামীম গ্রুপ এবং
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বিসিআই

মিজ আসমা বেগম
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ মুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশন

মিজ জাহানারা বেগম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

জনাব জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
সংযুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

জনার শহীদুল্লাহ চৌধুরী
প্রেসিডিয়াম সদস্য, সিপিবি

জনাব তুহীন চৌধুরী
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং
সভাপতি, সাভার-আশুলিয়া আঞ্চলিক কমিটি
গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ
সিপিবি

জনাব আনিসুল হক
প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই এবং
চেয়ারম্যান, মোহাম্মদী গ্রুপ

জনাব ফায়জুল হক
সিনিয়র ইনফরমেশন অফিসার এবং
পিআরও, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার

জনাব ফজলুল হক
সভাপতি, বিকেএমইএ

জনাব সাইফুল হক
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

জনাব আব্দুল কাদের হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শ্রমিক জোট

জনাব মোঃ নাজমুল হাসান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লেদারেক্স ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ এবং
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং
অ্যাসোসিয়েশন

জনাব এস কে মনোয়ার হোসেন
পরিচালক, বিকেএমইএ এবং
চেয়ারম্যান, একটিভ কম্পোজিট মিলস লিমিটেড

জনাব তফাজ্জল হোসেন বাগু
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপ-সচিব (শ্রম)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার

জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম
দ্বিতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ এবং
নির্বাহী পরিচালক, ওনাস গার্মেন্টস লিমিটেড

জনাব সিরাজুল ইসলাম
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ

ব্যারিস্টার জেনিফা কে জব্বার
অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

জনাব আরশাদ জামাল দিপু
পরিচালক, বিজেএমইএ এবং
চেয়ারম্যান, তুসুকা ফেব্রিক্স লিমিটেড

জনাব মোঃ আবুল কাশেম
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার

অ্যাডভোকেট দেলওয়ার হোসেন খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন

জনাব হায়দার আকবর খান রনো
কনভেনর, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

জনাব মঞ্জুরুল আহসান খান
প্রেসিডেন্ট, সিপিবি

লে. কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ ফারুক খান, পিএসসি, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার

ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

জনাব রিয়াজ-বিন-মাহমুদ (সুমন)
পরিচালক, বিকেএমইএ এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লা-বেল গ্রুপ

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান
উপ-পরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর

জনাব কে এম মিন্টু
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং
সাধারণ সম্পাদক, সাভার-আশুলিয়া আঞ্চলিক কমিটি
গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

মিজ শামীমা নাসরীন
সভাপতি
স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন

জনাব রফিকুজ্জামান
সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন

জনাব আবিদুর রহমান
উপ-সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার

জনাব কামরান টি রহমান
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং
চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক
জুবিলী জুট মিলস লিমিটেড

ব্রি. জেনারেল (অব.) এম মফিজুর রহমান, পিএসসি
প্রাক্তন নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা

মিজ রোকেয়া আফজাল রহমান
প্রাক্তন উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং
চেয়ারম্যান, এয়ারলিংক গ্রুপ
চেয়ারপার্সন ও নির্বাহী পরিচালক, আর আর গ্রুপ

জনাব তৌহিদুর রহমান
সভাপতি
বাংলাদেশ অ্যাপারেলস্ ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

জনাব মামুনুর রশিদ
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

মিজ সাকি রেজওয়ানা
নির্বাহী পরিচালক
ঐশি ফাউন্ডেশন

জনাব আবদুল কাইয়ুম সরদার
অতিরিক্ত পরিচালক
শ্রম ও কর্মসংস্থান অধিদপ্তর

জনাব আব্দুল হাই সরকার
প্রেসিডেন্ট, বিটিএমএ

মিজ শাহিদা সরকার
সদস্য, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক দল

হাজী মোঃ শহিদুল্লাহ
সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক দল

জনাব সালাউদ্দিন স্বপন
সভাপতি, জাতীয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

জনাব মোঃ লোকমান হাকিম তালুকদার
পরিচালক, শ্রম ও কর্মসংস্থান অধিদপ্তর

জনাব শাহ মোঃ আবু জাফর
সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক পার্টি

সাংবাদিকদের তালিকা

জনাব মোঃ শাকের আদনান
রিপোর্টার, বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)

জনাব রাজিব আহাম্মেদ
ইকোনোমিক রিপোর্টার, দৈনিক মানব জমিন

জনাব রোকনুজ্জামান অঞ্জন
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ

জনাব সাইফুদ্দিন অভি
রিপোর্টার, দৈনিক ভোরের কাগজ

জনাব মমিনুল হক আজাদ
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর

জনাব রেজাউল বাসার
স্টাফ রিপোর্টার, বিডি নিউজ ২৪

জনাব সঞ্জয় চাকী
স্টাফ রিপোর্টার, চ্যানেল আই

জনাব শাহাবুদ্দিন চৌধুরী
স্টাফ রিপোর্টার, রেডিও টুডে

জনাব তপন দে
স্টাফ রিপোর্টার, দ্য ডেইলি ডেস্টিনি

জনাব ফাহাদ ফেরদৌস
স্টাফ রিপোর্টার
ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি)

জনাব পুলক ঘটক
সিনিয়র রিপোর্টার, দ্য নিউ নেশন

জনাব ফখরুল ইসলাম হারুন
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো

জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
স্টাফ রিপোর্টার, বাংলা ভিশন

জনাব শফিকুল ইসলাম
ইকোনোমিক রিপোর্টার
দৈনিক আমাদের সময়

জনাব সুবির কুমার
ফটোগ্রাফার, দৈনিক আমাদের সময়

জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ
সিনিয়র রিপোর্টার, চ্যানেল ওয়ান

জনাব ফারুক মেহেদী
সিনিয়র রিপোর্টার, আরটিভি

জনাব শাহাদাৎ পারভেজ
সিনিয়র ফটোজার্নালিস্ট
দৈনিক প্রথম আলো

জনাব সাদেকুর রহমান
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সংগ্রাম

জনাব জসীম উদ্দিন সরকার
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আমার দেশ

মিজ শারমিন সাম্‌স
স্টাফ রিপোর্টার, দেশ টিভি

জনাব খাজা মঈন উদ্দিন
সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার
দ্য নিউ এজ